কলা অনুষদ পত্রিকা, খণ্ড : ১৪, সংখ্যা : ১৯, জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৪
DOI:

জহির রায়হানের ছোটগল্প:সময়, সমাজ ও রাজনীতি

হুমায়রা আফরোজ*

Abstract: Zahir Raihan is not just a literary figure; rather, his most significant identity surpasses literature as a patriot. From the language movement of 1952 to the Liberation War of 1971, he was actively involved. Even after the long-cherished victory of Bangladesh, the nation and Bengali literature have permanently lost this legendary figure. Zahir Raihan was known as an intellectual as well as a Bangladeshi writer, and he went missing in post-war independent Bangladesh. Among Bangladeshi writers, Zahir Raihan possessed a unique identity in thought, consciousness, and action. He wrote 21 stories at the age of 36. His direct participation in Bangladesh's national movements allowed him to easily sketch the tumultuous and turbulent times of that era. Drawing from direct experience, the calamities of national life, crises, and public engagement are integrated seamlessly into his short stories. The aspirations and struggles of the majority of middle and lower-middle-class people of that time, their protests against injustice, and the history of their participation in resistance are reflected in the themes and character portrayals of his stories. Therefore, the main aim and objective of this essay is to discuss the theoretical and practical aspects of society and politics in the context of Zahir Raihan's short stories related to the language movement.

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রোমান্টিসিজমকে এক প্রকার চ্যালেঞ্জ করে যাত্রা শুরু হয়েছিল Realism অথবা বাস্তববাদের। সাহিত্যে নতুন নতুন তত্ত্বের আবিষ্কার, ফ্রয়েডের সমাজদর্শন, 'কল্লোল', 'কালি কলম', 'প্রগতি' পত্রিকার হাত ধরেই মূলত বাস্তববাদের ধারা শুরু হয়েছিল। জগদীশ গুপ্ত এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই বাস্তব ঘটনাকেন্দ্রিক সাহিত্য রচনার জোয়ার দেখা দিয়েছিল বাংলাদেশের সাহিত্যেও। বাংলাদেশের সাহিত্যের বয়স খুব একটা বেশি না। কারণ, বাংলাদেশের সাহিত্যের পদধ্বনি শোনা যায় মূলত '৪৭ পরবর্তী সময় থেকে। দেশভাগের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতন, সামাজিক, আঞ্চলিক উপকরণ নিয়ে দেশীয় সাহিত্যিকেরা সাহিত্য রচনা শুরু করেছিলেন। বাংলাদেশের সাহিত্যে আলাউদ্দিন আল আজাদ, রশীদ করিম, রিজিয়া রহমান, সেলিনা হোসেন, শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখ ঔপন্যাসিকের হাত ধরেই বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ ও রাজনীতি স্থান করে নিয়েছে সাহিত্যে। এদের মধ্যে কতিপয় সাহিত্যিকের দেশের রাজনৈতিক ঘটনা সংবলিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকলেও অনেকেই ছিলেন অনভিজ্ঞ। জহির রায়হান বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে স্বতন্ত্র। কারণ, পূর্ব বাংলার জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম পর্যন্ত সবগুলো ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তিনি। তাই তাঁর রচিত সাহিত্য এবং সাহিত্যের চরিত্রগুলো অত্যন্ত বাস্তব এবং ইতিহাসঘেষা। তবে জহির রায়হান তাঁর ছোটগল্পের চরিত্র হিসেবে নির্বাচন করেছেন গ্রাম থেকে

* প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

আসা ঢাকা কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজকে এবং বিষয় হিসেবে নিয়েছেন রাজনৈতিক ঘটনাগুলোকে। প্রাবন্ধিকের মতে:

> অন্যান্য কথাশিল্পীর সঙ্গে তাঁর এখানেই পার্থক্য যে, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পটভূমিকে তিনি কেবল জীবনশিল্পীর দৃষ্টিতে অবলোকন করেননি, একইসঙ্গে চিত্রশিল্পীর মতো ক্যামেরা দিয়ে লেন্সবন্দীও করেছেন। ফলে স্থান-কাল-চরিত্রের জটিল ঘূর্ণাবর্ত কেবল মুদ্রিত আকারেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সেলুলয়েডের পর্দায় সজীব রক্ত-মাংসের চরিত্র হিসেবেও উপস্থাপিত হয়েছে। (ড.প্রতাপ, ২০২৪:১৫১)

'৫২-র ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সক্রিয় কর্মী ছিলেন জহির রায়হান। ২১ শে ফেব্রুয়ারি সকালে ১৪৪ ধারা জারি ভঙ্গ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দশ জনের খণ্ড খণ্ড যে মিছিল বের হয়েছিল, তার প্রথম দশজনের একজন ছিলেন জহির রায়হান। এছাড়াও রাজনৈতিক কারণে ১৯৫৫ ও ১৯৫৭ সাল গ্রেফতার হয়ে কারাভোগ করেছিলেন। ভাষা আন্দোলন দ্বারা তিনি এতটাই আলোড়িত হয়েছিলেন যে, তাঁর গল্প, উপন্যাস ও চলচ্চিত্রেও আন্দোলনের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয়। ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে উপজীব্য করে লিখেছেন 'একুশের গল্প', 'সূর্যগ্রহণ'সহ আরও কয়েকটি গল্প। জহির রায়হানের সৃষ্টিশীলতার পেছনে '৫২-র প্রভাব নিয়ে মতিউর রহমান তাঁর *জহির রায়হান : অনুসন্ধান ও ভালোবাসা* গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন:

> এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে জহির রায়হান অমর একুশের মানব সন্তান। 'একুশের গল্প', 'আরেক ফাল্গুন' কিংবা 'একুশে ফেব্রুয়ারী' উপন্যাস অথবা 'জীবন থেকে নেওয়া' চলচ্চিত্র পরিচালনার মধ্য দিয়ে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে বেঁধেছেন অমর ধ্রুবতারায়। (কাজী জাহিদুল, ২০২৪:১৬)

জহির রায়হান আদ্যোপান্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন বলে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং সময়ের অভিঘাতকেই ফ্রেমবন্দি করেছেন কখনো সিনেমায়, কখনো সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়। এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার জন্য জহির রায়হানের সাহিত্যের ধরন সমসাময়িক অন্য সকল সাহিত্যিকের চেয়ে ব্যতিক্রমধর্মী ছিল। জহির রায়হান '৭১ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সব রাজনৈতিক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন বলে ইতিহাসের স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায় তাঁর সাহিত্যে। জহির রায়হানের রাজনৈতিক জীবন ও শিল্পীজীবন নিয়ে 'জহির একটি চেতনা' নামক প্রবন্ধে আলমগীর কবিরের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য:

> জহির রায়হানের রাজনৈতিক জীবন ও শিল্পীজীবনের সূচনা প্রায় একই সময়ে। জহিরের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সূর্যগ্রহণ' থেকে শেষ পর্যন্ত সকল সাহিত্যকর্মই universal humanism-এ উদ্বুদ্ধ এবং social realism -এ সম্পৃক্ত। শিল্পীর সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে সে ছিল সদা সচেতন। সে বিশ্বাস করত যে শিল্পীর মহান দায়িত্ব হল আপামর জনসাধারণকে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। (মতিউর, ২০২১:১৯১)

জহির রায়হান তাঁর বড়ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারের প্রভাবে ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতি ঘনিষ্ট ছিলেন বলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোতে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন। জহির রায়হানের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে শাহরিয়ার কবীরের মতামত উল্লেখযোগ্য:

> শহিদুল্লাহ কায়সার তখন কোলকাতার একজন ছাত্রনেতা। প্রকাশ্যে ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে এবং গোপনে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত। জহির রায়হান তখন পার্টির কুরিয়ার ছিলেন।... রায়হান ছিল ওর 'টেকনেম'- পার্টি পরিচয়ের ছদ্মনাম তার পিতৃপ্রদত্ত নাম জহিরুল্লাহ। (ড. প্রতাপ, ২০২৪:১৫২)

'৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৭১-র মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটা রাজনৈতিক ঘটনায় তিনি সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, সংগ্রহ করেছেন দুর্লভ ছবি। এমনকি এসব আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে করেছিলেন কারাবরণও। জহির রায়হান ভাষা আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা অবলোকন করেছিলেন এবং তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই সৃষ্টি করেছেন সাহিত্য ও সাহিত্যের চরিত্রসমূহ। ফলে জহির রচিত ভাষা আন্দোলনের চরিত্রগুলো লক্ষ করলে দেখা যায়, হাইকোর্টের কেরানি, ছাত্রসমাজসহ অন্যান্য শ্রেণি-পেশার মানুষের উপস্থিতি। মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকেও হাইকোর্টের কেরানি, ছাত্রদের লাশের বর্ণনা জহিরের গল্পের বর্ণনার সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। জহির রায়হানের আত্মকথা থেকে ভাষা আন্দোলনে তাঁর সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জানা যায়:

> একদিন। সে অনেকদিন আগের কথা। বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। সেদিন অপরাহ্ণে, সে আমার মনে এক দুর্জয় সাহসের সঞ্চার করেছিল। সে বলেছিল, ওই হিংস্র দানবের মুখোশগুলো খুলে ফেলো। ভেঙে ফেলো ফেরাউনের দুরাশার স্বর্গ। নইলে তোমার কণ্ঠ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে। আমি তক্ষুনি সাড়া দিলাম।
>
> আর আমার আবেগ আমাকে কারাগারের অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষেপ করল। (কাজী জাহিদুল, ২০২৪:২৭)

জহির রায়হানের ছোটগল্পের বিষয়বস্তু মূলত সামাজিক-রাজনৈতিক অভিক্ষেপ থেকে আহরণ করা। ফলে তাঁর সাহিত্যের প্রেক্ষাপট এবং চরিত্রে ইতিহাস ঘনিষ্টতা লক্ষণীয়। ব্যক্তিজীবনে রাজনীতি সংশ্লিষ্ট থাকায় সমাজকে অবলোকন করেছেন প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনায় মধ্যবিত্তের অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগ এক অনস্বীকার্য ইতিহাস। জহির রায়হান সুনিপুণভাবে মধ্যবিত্তের রাজনীতি সংশ্লিষ্টতা, মানসিক টানাপড়েন, মনস্তত্ত্ব চিত্রিত করেছেন তাঁর ছোটগল্পে। এছাড়াও বহির্বিশ্বের আধিপত্যবাদী রাজনৈতিক শক্তির বিরূদ্ধেও তিনি কলম ধারণ করেছিলেন, যার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত মন্তব্যে:

> সমকালীন নগরজীবনের নানামুখী সংকট উপস্থাপনের পাশাপাশি তাঁর ছোটগল্পে গ্রাম, সামন্ত মূল্যবোধের শোষণ, মধ্যবিত্তের সমস্যা, গোপন রাজনীতি, লম্পট, সর্বহারা প্রভৃতি চরিত্র এবং প্রতিবেশ পাওয়া যায়। গল্পের ক্ষেত্রে জহির রায়হান সমাজ সচেতন বস্তুভিত্তিক রচনায় নিবিষ্ট। সমগ্র বিশ্বে যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী, আধিপত্য বিস্তারের লোলুপ দানব শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর লেখনীতে তীব্র প্রতিবাদ উচ্চারিত। উপন্যাসের চাইতে জহিরের ছোটগল্পে ভাবালুতা কম। (আফজালুল, ১৯৮৬:১০০)

জহির রায়হানের সাহিত্যে মধ্যবিত্ত সমাজ প্রসঙ্গে সমালোচকের আরও একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> বিকাশমান বাঙালি মধ্যবিত্তের দ্বন্দ্ব-জটিল, বিবর্ণ অবস্থা এবং সীমিত আয়ের কেরানির স্বপ্নময় জীবন কল্পনা ও ভবিষ্যৎ ভাবনার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে জহির রায়হানের সাহিত্যে। (রফিকউল্লাহ, ১৯৯৭)

জহির রায়হানের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বরূপ বুঝতে হলে প্রথমে মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। মধ্যবিত্ত শ্রেণির ইংরেজি প্রতিশব্দ Middle class. যার আরেকটি বাংলা অর্থ হিসেবে মধ্য শ্রেণিও বোঝায়। Middle class অর্থে মধ্যবিত্ত বা মধ্য শ্রেণি আধুনিক পুঁজিবাদী ও শিল্প সভ্যতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলে নিম্নবিত্ত এবং নির্বিত্ত উভয়েই মধ্য শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে । অর্থাৎ মধ্যবিত্ত এমন একটি শ্রেণি যা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থায় মধ্যবর্তী একটি অবস্থান অধিকার করে। সাধারণত বুর্জোয়া এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হলেও শব্দ দুটির

আলাদা অর্থ রয়েছে। ফরাসি শব্দ বুর্জোয়ার অর্থ নাগরিক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে ব্যবসায়ী বা দোকানদারকে বুঝায়। কিন্তু বিশেষ অর্থে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে বোঝায়:

> একটি সমাজ, যা কালচারে ধনী সম্প্রদায়ের এবং যারা শিল্প বা ব্যবসায়ে প্রভুত্ব করে ও যার আয় হচ্ছে ব্যবসায় ও শিল্পকর্ম যারা করে তাদের থেকে লব্ধ, অথচ যারা কায়িক পরিশ্রমে এসব কাজ করে না। আরও বিশেষ অর্থে বোঝায় ইউরোপে রেনেসাঁ ও রিফর্মেশানের সঙ্গে ধনতান্ত্রিক সমাজে জাত প্রভাবশালী কালচার; আর পাক-ভারতে বোঝায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঞ্জাত অভিসারী নব্য সমাজ। (আবদুল, ২০১১: ৫৫)

ইংল্যান্ডে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে একটা বিশিষ্ট ঐতিহ্যবাহী সমাজকে বোঝাত, যারা আর্থিক বিন্যাসে পুঁজিপতি ও মজুর শ্রেণির তুলনায় মধ্যবর্তী স্তরের ছিলেন। তারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থাকলেও তাদের জীবনযাত্রার মান ও আচার-ব্যবহার একই প্যাটার্নের হত। এছাড়াও তারা কতগুলো উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুসারী ছিলেন যা তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে প্রকাশ পেত। তারা বুদ্ধির মুক্তি, সামাজিক প্রগতি, ব্যক্তিস্বার্থের প্রতি উদার দৃষ্টি ও রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিকতার আদর্শ ধারণ করতেন। তাদের এই আদর্শ ও মূল্যবোধ দ্বারা জনগণকে প্রভাবিত করেছিলেন সবচেয়ে বেশি।

মূলত মধ্যযুগেই মধ্যবিত্ত আবির্ভাবের উপাদানসমূহ প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তখন এই ধারণা দানা বাঁধতে পারেনি। কিন্তু পরবর্তীতে সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে ইংরেজরা এই উপাদানগুলো ব্যবহার করেছিলেন সুকৌশলে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান ভারতবর্ষের মৌলিক কোনো ঘটনা না। সামাজিক ও আর্থিক কল্যাণদৃষ্টি থেকে নয় বরং তাঁবেদার অনুকারী হওয়ার বীজমন্ত্র থেকে বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান হয়েছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের ভেতর দিয়ে হলেও এই শিক্ষার উদ্দেশ্য মহৎ মূল্যবোধের জন্য ছিল না বরং ব্রিটিশদের অর্থনীতিক ও সামাজিক চাহিদা মেটানোই মূল উদ্দেশ্য ছিল। যার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নোল্লিখিত বক্তব্যে:

> ব্রিটিশ শিক্ষানীতির ফলে যে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হলো, তার প্রধান লক্ষ্য ছিল সরকারি চাকুরিতে ও কাউন্সিলে ব্যক্তিগত পদমর্যাদায় বৃত হওয়া, জনশিক্ষার প্রসার কিংবা দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন নয়। (Misra,১৯৬১:৫৬)

উপরিউল্লিখিত এই মুষ্টিমেয় শ্রেণিই পাশ্চাত্য শিক্ষার বিকিরণ, কারিগরি অর্থকরী শিক্ষার সম্প্রসারণের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল। এই মুষ্টিমেয় শ্রেণি থেকেই মূলত সরকারি চাকুরে, ডাক্তার, উকিল, শিক্ষকবৃন্দ প্রভৃতি পেশাজীবীর আবির্ভাব হয়েছিল। পাশ্চাত্য মধ্যবিত্ত শ্রেণি এদেশে সংখ্যায় অল্প হলেও কয়েক দশকের মধ্যে তারা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করে উচ্চ বুর্জোয়া শ্রেণিতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এসব মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি তালিকা আবদুল মওদুদ তার 'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ সংস্কৃতির রূপান্তর' নামক গ্রন্থে তুলে ধরেছেন যা নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. কারবার (হৌস) সমূহের ব্যবসায়ী, গোমস্তা অংশীদারীগণ, ডিরেক্টরগণ- উচ্চস্তরের পাইকারি ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী ও অর্থদাদনকারী কারবারসমূহ বাদে।

২. বেতনভোগী ম্যানেজার, ইনস্পেক্টর, সুপারভাইজার ও বিশেষজ্ঞ দল, যারা কারবারে, ব্যাংকে, উৎপাদনকেন্দ্রে নিয়োজিত থাকেন।

৩. বণিক সভাসমূহের কর্মচারী, ট্রেড ইউনিয়ন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং রাজনৈতিক দলের কর্মী ও অফিস কর্মচারী; সমাজকল্যাণমূলক সংস্থাগুলোর কর্মচারী।

৪. ভূমির মধ্যস্বত্বাধিকারী মালিকবৃন্দ (টেনিওর হোল্ডার); খাজনাভোগী ইজারাদারগণ; জলকর, বনকর প্রভৃতির উপস্বত্বভোগীরা; ভাগচাষের জমির উপস্বত্বভোগীরা।

৫. সরকারি চাকুরে ও অন্যান্য আধা-সরকারি কিংবা স্থানীয় সংস্থাগুলোর চাকুরে; জনসংস্থা, শিক্ষা, কৃষি, যানবাহন (রেলসহ) প্রভৃতি সংস্থাসমূহের চাকুরে।

৬. অনগণ্য সকল প্রতিষ্ঠানের কেরানি ও অন্যান্য শ্রেণির চাকুরে।

৭. শিক্ষায়তনসমূহের শিক্ষক শ্রেণি; লোক্যাল, মিউনিসিপাল প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকুরে।

৮. অর্থকরী পেশায় নিযুক্ত ডাক্তার, উকিল, কম্পাউন্ডার, মুহুরী, কলেজের অধ্যাপক, কবি-সাহিত্যিক-লেখক শ্রেণি, সাংবাদিক শ্রেণি, চিত্রশিল্পী, সংগীতশিল্পী, ধর্মীয় প্রচারক শ্রেণি ও ধর্মীয় পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা; প্রকাশক ও মুদ্রাকর শ্রেণি ।

৯. সম্পন্ন দোকান-মালিকগণ ও হোটেল-মালিকগণ এবং তাদের ম্যানেজার ও হিসাবরক্ষক প্রভৃতি।

১০. চা বাগান প্রভৃতি ক্ষেত্রের ম্যানেজার ও বেতনভুক্ত কর্মচারী।

১১. বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যান্য শিক্ষায়তনে, গবেষণাগারে নিযুক্ত ও শিক্ষারত ছাত্রবৃন্দ।

ব্রিটিশ ভূমিবিষয়ক পরিবর্তিত নীতির ফলে ভূমির সঙ্গে সম্পর্করহিত মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণিদের উদ্ভবের পাশাপাশি গ্রাম্য মহাজন শ্রেণিরও উদ্ভব হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসন নীতি, ব্রিটিশের অর্থনীতি, বিচার ও ন্যায়নীতি এবং অন্যান্য নীতির ফলে বহু শ্রেণির চাকুরে ও উকিল-মোক্তার এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। পলাশী যুদ্ধে পর আঠারো শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে যে শ্রেণির মধ্যবিত্ত আবির্ভাব হয়েছিল তাদের আদি পুরুষরা ছিল ইংরেজ হৌসে ও ব্যাংকিং কর্মে নিযুক্ত দালাল পর্যায়ের। গোমস্তা, মুনিব, বৈশ্য, বেনিয়ান নামে তারা পরিচিত ছিলেন, মাদ্রাজে যাদের নাম ছিল দোভাষ এবং ইংরেজরা তাদেরকে বেনিয়ান বলে উল্লেখ করত। পাইকার, দালাল, গোমস্তা, মুৎসুদ্দি শরফ বা পোদ্দারদের হাত ধরে এ দেশে ইংরেজদের সাথে বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়েছিল। ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব লাভ, ভূমি ও জমিদারিতে অর্থনিয়োগের সুযোগ অর্জন, আন্তঃশুল্ক ব্যবস্থা, ইউরোপীয় কলোনাইজেশনের বাধানিষেধ, ইংরেজ এজেন্সির হৌস প্রতিষ্ঠা অবাধ বাণিজ্য নীতি প্রভৃতি কারণে ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

অবাধ নীতির ফলে কলকাতায় বহু বাণিজ্যিক সংঘ স্থাপিত হয়েছিল। এসব সংঘ বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণ ছাড়াও ব্রিটিশ রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য অভ্যন্তরীণ নানা বিষয়ের তথ্য, পরিসংখ্যান সংগ্রহ, পথ, জলপথ, সেচপ্রণালি, রাজস্ববিধি সম্পর্কিত আইনসমূহ, ব্যক্তি-সম্পত্তি, বাণিজ্য, শিল্প সম্পর্কিত অধিকার ও আইন এমনকি বিচার বিভাগের তথ্য সরবরাহের কাজও করতেন। এই শ্রেণির মাধ্যমেই ইংরেজরা এদেশের গণ ও সমাজজীবনের যাবতীয় তথ্য পেতেন:

> ভারতীয় সমাজ, সমাজজীবন, রীতিনীতি, বিধিবিধান সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানের পাঠ এরাই ইংরেজদের সরবরাহ করত; আর বৈষয়িক এবং শাসনকার্যাদির ব্যাপারে ইংরেজকে এদের উপরেই নির্ভর করতে হতো। (অরবিন্দ, ১৩৬২:১০)

বাংলার বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের সন্তানদের বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে ইংরেজরা এ দেশে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। এ প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন রায়, রামদুলাল দে, দ্বারিকানাথ ঠাকুর, আশুতোষ দে, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নাম অনস্বীকার্য। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের বিকাশ দ্রুত বৃদ্ধি

পেলেও শিল্পক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের বিকাশ ছিল ধীরগামী। বস্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতা মূলত শিল্পক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণি সংগঠনের প্রধান অন্তরায় ছিল। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণেই মূলত ইংল্যান্ডের মত এদেশে শিল্প সম্বন্ধীয় সমাজ খুব সহজে গড়ে উঠেনি। আবার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির যে উত্থান হয়েছিল তার পেছনে পাশ্চাত্য শিক্ষার উদ্দেশ্যটাই মুখ্য ছিল। ইংরেজরা শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণি সংগঠন করতে চেয়েছিলেন তিনটি উদ্দেশে, প্রথমত সরকারি ও বেসরকারি অফিসসমূহে কর্মচারীর চাহিদা পূরণ; দ্বিতীয়ত অর্থনৈতিক কারণ এবং তৃতীয়ত খ্রিস্টধর্ম প্রচার। তবে এই তিনটির সমবায়ে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে মোহমুগ্ধ এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবী ইংরেজ-স্তাবকের সৃষ্টি করা, যারা আপন স্বার্থেই ইংরেজি শাসনের স্থায়িত্ব সাধনে প্রধান সহায়ক হবে। (আবদুল, ২০১১ : ৮৪)

ইংরেজি শিক্ষা ছিল অর্থ উপার্জনের একটি বড় হাতিয়ার। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এদেশে যেসব কর্মজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণি উদ্ভব হয়েছিল তন্মধ্যে আইনজীবীরাই সবচেয়ে শক্তিশালী ছিলেন। আইনজীবী ছাড়াও সরকারী কর্মজীবী, চিকিৎসক, লেখক, প্রকাশক, মুদ্রাকর প্রভৃতি কর্মজীবী শ্রেণি গড়ে উঠেছিল ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে। মিশনারির কাজের সুবিধার জন্যই মূলত ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন শুরু হয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষার একটি প্রচ্ছন্ন কারণ ছিল খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার। এমতাবস্থায় ইংরেজি শিক্ষার মধ্য দিয়ে খুব সহজেই হিন্দুদের সুসমাচারের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছিল:

> ইংরেজির প্রতি হিন্দু বেনিয়ান, সরকারদের আকর্ষণ পূর্বেই জন্মেছিল, এখন সরকারি অফিসে চাকরির জন্য ইংরেজি শিক্ষার আকর্ষণ আরও জন্মানোর চেষ্টা চলল মিশনারীদের মাধ্যমে। খ্রিস্টান হলেই চাকরি নির্ঘাত- অতএব মিশনারি সাহেবদের প্রলোভনে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারও বৃদ্ধি পেতে লাগল। (আবদুল, ২০১১: ৯১)

রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার প্রলোভনে বাংলায় ইংরেজদের শাসনকে হিন্দুরা আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করলেও মুসলমানরা ছিল ঠিক তার বিপরীত। মুসলমানদের কাছে ইংরেজ শাসন ছিল বিধাতার চরম অভিশাপ, এছাড়াও তাদের রাষ্ট্রিক, আর্থিক, ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে তারা ইংরেজ শাসনকে দায়ী করেছেন এবং সৃষ্ট সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজছিলেন। ফলে ইংরেজ শক্তির প্রতি ভারতীয় মুসলমানরা বহু বছর যাবত অনমনীয় ছিলেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে ইংরেজদের সাথে মুসলমানদের বিদ্রোহ-বিক্ষোভ চলমান ছিল। পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর থেকেই ইংরেজদের সাথে মুসলমানদের অস্তিত্বের লড়াই চলতে থাকে যা ইংরেজদেরকেও শঙ্কিত করে তুলেছিল। ইংরেজদের প্রতি মুসলমানদের এই অসহযোগী, অনমনীয় সম্পর্ক সম্পর্কে হান্টার তাঁর 'ইন্ডিয়ান মুসলিম' গ্রন্থে মুসলিমদেরকে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে একটা মহাবিপদের উৎস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইংরেজদের সাথে মুসলমানদের বৈরী সম্পর্কের সূচনা ১৭৬৫ এর ফকির বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। পরবর্তীতে তিতুমীরের বিদ্রোহ, হাজী শরীয়তউল্লাহ ও দুদু মিয়ার আন্দোলন, পাটনার শাহ ইনায়েত আলী ও বিলায়েত আলীর কার্যকলাপ; বালাকোটের যুদ্ধ, সিত্তানা, মুলকা, পাঞ্জতরের ঘটনা, ১৮৬৪ সালের সীমান্ত অভিযান, আম্বালা ষড়যন্ত্র মামলার মধ্য দিয়ে এই উত্তাল অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

উনিশ শতকের শেষ সময় পর্যন্ত ইংরেজদের সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের সশস্ত্র যুদ্ধ হয়েছিল। সৈয়দ আহমদ ব্রেলভির নেতৃত্বে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদি সংগঠন গঠিত হয়েছিল। প্রথম দিকে বিজয়ী হলেও পরবর্তীতে বালাকোটে শোচনীয়ভাবে পরাজিত এবং নিহত হয়েছিলেন বিশিষ্ট আলেম ও সহকর্মী শাহ মুহম্মদ ইসমাইলের সঙ্গে। তাঁর মৃত্যুর পর পাটনার ইনায়েত আলী ও বেলায়েত আলী ব্রেলভীর সংগঠনকে আবার পুনর্জীবিত করেছিলেন। উভয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে জেহাদি আন্দোলন আবার জাগ্রত হয় এমনকি তাদের বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্ত্রীলোকেরাও

নিজেদের গয়না জেহাদি ভাণ্ডারে দান করেছিলেন বলে জানা যায়। এই জেহাদি সংগঠনে অভিজাত মৌলানা, জঙ্গি কন্‌স্ট্রাক্টর, সিপাহি, সাধারণ চাষী, কসাই নির্বিশেষে সব শ্রেণির লোকের অংশগ্রহণ ছিল যা ইংরেজ শাসকদেরকেও বিচলিত করে তুলেছিল। মুসলমানদের এই জেহাদকে ইংরেজরা ওহাবি আন্দোলন বলে আখ্যা দিয়েছিলেন, যদিও মুহম্মদ বিন আব্দুল ওহ্‌হাব যে পিউরিটানিক বা অতিনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন তার সাথে ভারতীয় মুসলমানদের এই আন্দোলনের পার্থক্য ছিল অনেক বেশি। ধারণা করা হয় ভারতীয় মুসলমানদের সহানুভূতি নষ্ট করে তাদের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ জানাগোর জন্য ইংরেজরা জেহাদি আন্দোলনকে ওহাবি আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। ইংরেজ কথিত মুসলমানদের এই ওহাবি আন্দোলন মূলত কোনো রাজা-বাদশা কিংবা রাজপুরুষের স্বার্থে পরিচালিত হয়নি বরং এই আন্দোলন ছিল বিদেশি ও বিধর্মী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য:

> আরব দেশে ওহাবী আন্দোলনের উদ্ভব হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে যে অনুরূপ আন্দোলন হয়, তাহার সহিত ওহাবীদের কোনো সম্বন্ধ ছিল এমন কোনো প্রমাণ নাই। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রায়বেরেলির সৈয়দ আহমেদ ব্রেলভি যখন ভারতে এ আন্দোলনের প্রবর্তন করেন, তখনও তিনি আরবদেশে যান নাই। তাঁদের দল অনেকটা দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হইবার পর তিনি মক্কা গমন করেন। ভারতে তিনি এক বিরাট সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাহা প্রথমে শিখ ও পরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে তুমুল সংগ্রাম করে, তাহাই এই আন্দোলনের প্রধান কীর্তি। ইহার সহিত ওহাবী মতের কোনো সম্বন্ধ নাই। (প্রবাসী, ১৩৫৬:১৮৮)

উনিশ শতকের শেষ শতকে ইংরেজদের সাথে মুসলমানদের বৈরী সম্পর্কের পর বিশ শতকের প্রথমার্ধেই মুসলমানদের রাজনীতি সচেতন হতে দেখা যায়। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এবং ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদের পরবর্তী সময়ে সমগ্র ভারতেই নতুন হাওয়া বইতে শুরু হয়। মুসলিমরা সংখ্যালঘু থাকায় রাজনীতি, চাকরিক্ষেত্র থেকে দীর্ঘদিন বঞ্চিত হয়েছে; পরবর্তী কালে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে নতুন প্রদেশ এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণের স্বপ্ন হাতছানি দেয় পূর্ববাংলার রাজনীতি সচেতন মানুষকে। অপরদিকে, বঙ্গভঙ্গ রদের ঘটনায় পূর্ববাংলার জনগণের আশাভঙ্গ হলেও ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার জনগণ আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু করে যার পরে পূর্ব বাংলা, তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিতে আসে নব জোয়ার। এমনকি কংগ্রেসের সাথে পাল্লা দিয়ে মুসলিমরা নিজেদের রাজনৈতিক দল গঠন করে নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার পাকাপোক্ত করে। ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতে ইংরেজ বিদ্বেষ এবং ইংরেজদের বিরোধীতার স্থলাভিষিক্ত হয় হিন্দু-মুসলিম অধিকার আদায়ের আন্দোলন। যার ফলশ্রুতিতে মুসলিম লীগ গঠন, জিন্নার দ্বি-জাতিতত্ত্ব, লাহোর প্রস্তাব, ভারত ভাগের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ এদেশ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়, হিন্দু-মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ভারত-পাকিস্তান ভাগ হয় এবং সর্বোপরি রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উন্মেষ ঘটে।

১৯৪৭ এর দেশভাগের ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে নানা বৈষম্য দৃষ্টিগোচর হয়। পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য দৃশ্যমান কোনো রাজনৈতিক দল প্রাথমিকভাবে না থাকলেও পশ্চিম পাকিস্তান যখন সংবিধান প্রণয়ন করতে বিলম্ব করছিল তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ থেকে তরুণ রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিবর্গ উঠে এসেছিলেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে গঠনমূলক সমাধানের কথা বলছিলেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান দেশভাগের পর দীর্ঘ সময় ধরে সংবিধান প্রণয়নসহ অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারছিল না। পরবর্তী সময়ে '৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দল নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করলে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে রাজনৈতিক সমস্যা দানা বাঁধতে শুরু করে। পরবর্তীতে ভাষার প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের উপর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দিতে চাইলে মধ্যবিত্ত শ্রেণিদের সর্বোচ্চ

অংশগ্রহণের ভেতর দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলা অর্জিত হয়। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে পূর্ব বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক উত্থান পরবর্তীতে এদেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করে দেয় যার ফলশ্রুতিতে আমাদের ইতিহাসে যোগ হয় '৬৬-র ৬ দফা, '৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান, '৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ এবং সর্বোপরি '৭১-র মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জন। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান পূর্ব বাংলা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণির এই রাজনীতি সচেতনতা এবং অবদান নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অসংখ্য সাহিত্য রচিত হয়েছে যার মধ্যে জহির রায়হানের সাহিত্যে তাঁর দেখা বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলনও দেখা যায়।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৯৫২ সালের আগে পূর্ব বাংলায় রাজনীতি খুব একটা সক্রিয় ছিল না। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা প্রভৃতিক্ষেত্রে পূর্ব বাংলা পিছিয়ে ছিল। কিন্তু পূর্ব বাংলার জনগণের প্রথম মোহভঙ্গ ঘটে ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদের মধ্য দিয়ে। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হলে ঢাকার জনগণ আবার স্বপ্ন দেখে নিজেদের রাজনৈতিক দল গঠনের। এই স্বপ্ন লালন করা জনগণের বিশাল অংশ ছিল মধ্যবিত্ত। পরবর্তীতে ঢাকা কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাত ধরেই তৈরি হয় এদেশের নিজস্ব রাজনৈতিক দল এবং এই মধ্যবিত্তের হাত ধরেই পর্যায়ক্রমে ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সবগুলো আন্দোলনে আসে সাফল্য। ফলে ঢাকার মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ সম্পর্কে বলা যায়:

> ... ষাটের দশকের প্রথমার্ধে ঢাকাকেন্দ্রিক একটি শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিকশিত হয়। এ শ্রেণি ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত এদেশের রাজনীতি-অর্থনীতিসহ সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। (সরওয়ার, ১৪১২)

জহির রায়হান তাঁর সমস্ত সাহিত্য গল্প, উপন্যাস, চলচ্চিত্র, ডকুমেন্টারি প্রভৃতিতে বাংলাদেশের আন্দোলন-সংগ্রামের শৈল্পিক চিত্রায়ণ করেছেন। চলচ্চিত্রের মানুষ বলেই তাঁর সাহিত্যে চলচ্চিত্রের পরিচর্যার সফল রূপায়ণ দেখা যায়। এছাড়াও ভাষা আন্দোলনভিত্তিক ছোটগল্পগুলোতে সীমিত পরিসরে বর্ণনাত্মক, বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যারীতি দেখা যায়। তাঁর ছোটগল্পের সবচেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছোট ছোট সংলাপে অনেক বড় কোনো ঘটনাকে তুলে ধরা। সিনেমা জগতের মানুষ বলেই সম্ভবত তাঁর ছোটগল্পে সংক্ষিপ্ত সংলাপ দেখা যায় যা গল্পগুলোকে করেছে আরও বেশি নাটকীয় ও ব্যঞ্জনাময়। জহির রায়হানের ভাষা আন্দোলনভিত্তিক ছোটগল্পগুলো হচ্ছে- সূর্যগ্রহণ, অতি পরিচিত, কয়েকটি সংলাপ, মহামৃত্যু, একুশে ফেব্রুয়ারি ও একুশের গল্প। উক্ত গল্পগুলোতে গল্পকার পরিমিত বর্ণনায় ভাষা আন্দোলনের ঘটনা, তাৎপর্য এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মধ্যবিত্ত শ্রেণির চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু লেখকের বিবরণে পরিমিতিবোধ থাকলেও, বিষয়বস্তুর ব্যঞ্জনা নিঃসন্দেহে অপরিমেয়। একইসাথে ভাষা আন্দোলনে জড়িত ছাত্র, সাধারণ মানুষ, শ্রমজীবী, নেতা এককথায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির অংশগ্রহণ এবং তাদের রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব ও ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখা যায় এই গল্পগুলোতে।

'সূর্যগ্রহণ' জহির রায়হানের একুশে ফেব্রুয়ারি-নির্ভর গল্প হিসেবে ধারণা করা যায়। গল্পকারের ভাষা আন্দোলনভিত্তিক অন্যান্য গল্পের সাথে এই গল্পের গঠনরীতির কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। অন্যান্য গল্পে তিনি সংক্ষিপ্ত সংলাপ, পরিমিত বাক্যব্যয় করলেও এই গল্পে বিবৃতিমূলক বর্ণনার মধ্য দিয়ে গল্পের বিষয় ফুটিয়ে তুলেছেন। বর্ণনাত্মক পরিচর্যার এর মধ্য দিয়ে জহির রায়হান ভাষা আন্দোলনের সময় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণকে তুলে ধরেছেন যা আনোয়ার সাহেবের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 'সূর্যগ্রহণ' রচনা প্রসঙ্গে কাইয়ুম চৌধুরীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> জহির তখন লিখছেন। প্রচুর। ছোটগল্প অনেক জমেছে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের গল্প। কৃষক, শ্রমিক, মজুরের গল্প। মেহনতি মানুষের গল্প। তাদের আন্দোলনের গল্প। সেই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার গল্প। মেহনতি মানুষের গল্প। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গল্প। এক সুন্দর লেখা নিয়ে বেরোল সূর্যগ্রহণ। জহিরের প্রথম বই। সাহিত্যিক জীবনের প্রথম ফসল। ইনল্যান্ড প্রেসের ব্যানারে। লিখিয়ে হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন জহির রায়হান, যার চিন্তাধারায় মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট। (মতিউর, ২০২১:১৯১)

জহির রায়হানের প্রায় সব ছোটগল্পের প্লটই মধ্যবিত্ত সমাজ মুখ্য । বাংলাদশের আন্দোলন সংগ্রামে মধ্যবিত্তের অংশগ্রহণ, স্বার্থান্বেষী মনোভাব সবই স্থান পেয়েছে তাঁর গল্পে। বায়ান্নর আন্দোলনকে কেন্দ্র করে লেখা 'সূর্যগ্রহণ' তাঁর অন্যতম সার্থক ছোটগল্প, যেখানে গল্পকার আন্দোলনে নিহত তসলিমের গল্পের পাশাপাশি আনোয়ার হোসেনের উদার মানবতাবাদের গল্প তুলে ধরেছেন। 'সূর্যগ্রহণে'র চরিত্রগুলো মধ্যবিত্ত সমাজের অংশ যারা গ্রাম থেকে শহরে এসেছিলেন নিজেদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে। কিন্তু তাদের মধ্যেই কেউ কেউ দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় তারা নিজের প্রাণ রক্ষা কিংবা সরকারের তোষামোদ করে চাকরি করার পরিবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দেশের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে। '৪৭ পরবর্তী সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের উপর সৃষ্ট নানামুখী আগ্রাসনের মধ্যে অন্যতম ছিল ভাষা বিষয়ক আগ্রাসন। গণপরিষদের অধিবেশনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দুর পরিবর্তে বাংলার দাবি সর্বপ্রথম তুলেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। পরবর্তীতে পাকিস্তানি শাসক উর্দুকেই পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ সমাবর্তন বর্জন করার সাথে সাথেই এই দাবি রূপান্তরিত হইয়েছিল গণমানুষের দাবিতে। এই গণদাবি ক্রমবৃদ্ধিমান গতিতে ছড়িয়ে পড়ে তসলিমের মত নিম্ন মধ্যবিত্তদের মধ্যেও যাদের চোখ ছিল স্বপ্নে বিভোর :

> তসলিম বলেছে আগে ভাষাকে বাঁচাতে হবে। ভাষাই যদি না থাকবে তো কবিতা লিখবো কি দিয়ে? বলে বেরিয়ে গেছে সে। সেদিন আর ফেরেনি। (জহির, ২০২৪:১২০)

জহির রায়হান তাঁর ছোটগল্পের বিষয়বস্তু ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি নামকরণেও দিয়েছেন মুন্সিয়ানার পরিচয়। 'সূর্যগ্রহণ' তেমনই একটি ছোটগল্প যেখানে গল্পের নামকরণের ভেতরেই লুকিয়ে আছে গভীর এক ব্যঞ্জনা। চাঁদ যখন পরিভ্রমণরত অবস্থায় কিছু সময়ের জন্য পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে এসে পড়ে, তখন পৃথিবীর দর্শকের কাছে সূর্য আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে কিছু সময়ের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায়। এই ঘটনাকে সূর্যগ্রহণ বলা হয়। মূলত অমাবস্যার পরে নতুন চাঁদ উঠার সময় এ ঘটনা ঘটে। পুরো গল্পটিতে আনোয়ার সাহেবের মনস্তত্ত্ব, অন্তর্দ্বন্দ্ব, মানসিক টানাপড়েনের যে নাটকীয় বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকে শুরুতেই কাহিনি বোঝা না গেলেও গল্পের শেষে এসে মূলভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে। আনোয়ার সাহেবের মেস সঙ্গী কবি তসলিম ভাষা আন্দোলনে নিহত হলে তসলিমের পরিবার, স্ত্রী-সন্তানদের জন্য তিনি বিবেকতাড়িত হয়ে পড়েন। এমনকি তসলিমের স্ত্রীর পাঠানো চিঠির উত্তর দিয়ে যান নিয়মিত। তসলিমের পরিবারের অর্থকষ্ট আনোয়ার সাহেবকে প্রবলভাবে তাড়িত করে বলে তিনি সম্পূর্ণ অচেনা হয়েও এই পরিবারকে অর্থ সাহায্য পাঠানোর তাগিদ অনুভব করেন এবং প্রতিমাসেই নিয়ম করে টাকা পাঠান, যার মধ্য দিয়ে মূলত তার মানবতাবাদী চরিত্রেরই পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পটিতে তসলিম সূর্যগ্রহণের সেই ঢেকে যাওয়া সূর্যের প্রতীক যাকে দেখা যায় না, কারণ আনোয়ার সাহেব চাঁদের মতোই মৃত তসলিমকে ঢেকে রেখেছেন বৃহৎ দায়িত্ব পালন করে। চাঁদের জন্য যেমন গ্রহণ লাগা সূর্যকে দেখা যায় না, তেমনি আনোয়ার সাহেব দায়িত্ব পালন করেছেন বলেই তসলিমের খোঁজ পান না তসলিমের পরিবার। এমনকি তিনি অনেক ভেবেও সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন তসলিমের মৃত তার পরিবারকে জানাবেন নাকি জানাবেন না:

> সারা রাত জেগে শুধু ভেবেছেন তিনি তসলিমের মৃত্যুর খবরটা কি জানাবেন হাসিনাকে? চিঠি লিখে কি জানিয়ে দেবেন ওদের যে তসলিম মারা গেছে। ওদের পরিবারে একমাত্র উপার্জনক্ষম লোকটা আর বেঁচে নেই। (জহির, ২০২৪:১২১)

আমরা জানি উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই ভারতে ইংরেজি শাসকের বদৌলতে মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছিল, যাদের মূল লক্ষ ছিল আর্থিক সুযোগ-সুবিধা আদায়। কিন্তু সময়ের ক্রমবিবর্তনে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছাড়াও অধিকার আদায়ে সচেষ্ট, আন্দোলনরত মধ্যবিত্তও দেখা যায়। যারা নানান আন্দোলন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে অর্জন করেছেন নিজেদের দেশ এবং ঐতিহ্য। জহির রায়হানের ভাষা আন্দোলন বিষয়ক ছোটগল্পগুলোতে দুই ধরনের মধ্যবিত্ত শ্রেণির উপস্থিতি দেখা যায়। এক ধরনের মধ্যবিত্ত যারা দেশের প্রয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে; অপরদিকে, আরেক দল ব্যস্ত ছিল শাসকগোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড সমর্থন করে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করতে। এঙ্গেলস তাঁর Revolution and Counter revolution in Germany গ্রন্থে Middle class শব্দবন্ধ ব্যবহার করেন। যেখানে তিনি বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি একই অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। উক্ত শব্দের মধ্য দিয়ে তিনি এমন এক শ্রেণির উল্লেখ করেন, যারা অভিজাততন্ত্র ও বুর্জোয়ার মাঝামাঝি-যাদের মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র দোকানদার, শ্রমজীবী মানুষ এবং গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্র চাষী। আবার ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বি.বি মিশ্র বলেন যে, এই শ্রেণির ধারণা ও প্রতিষ্ঠানকে ভারতে আমদানী করেছিল ব্রিটিশরা। আবার ভারতের মধ্যবিত্তের চরিত্র বিলেতের মধ্যবিত্ত চরিত্র থেকে আলাদা:

> The Indian middle class which the British aimed at creating was to a class of imitators, not the originators of new values and method. (অনির্বাণ, ২০১৪:০৬)

মিশ্রর মতে এই শিক্ষিত শ্রেণি নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির সম্পর্কে বেশি সজাগ ছিল। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল civil service ও council এ প্রবেশ করা। অর্থাৎ শাসক গোষ্ঠীর অংশ হওয়া। শিক্ষা প্রসার কিংবা অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের খুব একটা আগ্রহ ছিল না।

মিশ্র বর্ণিত এই শ্রেণির অংশে সাথে 'অতি পরিচিত' গল্পের ট্রলির বাবার সাদৃশ্য অত্যন্ত বেশি। গল্পে আমরা দেখতে পাই, একসময় ট্রলির বাবার অবস্থা একেবারেই ভালো ছিল না। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের তোষামোদি করে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করেছেন। অর্থাৎ সামন্ত-মূল্যবোধ আশ্রয়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণির আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার যে ইতিহাস তা ট্রলির বাবার চরিত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে:

> বুড়ো বললো, তখন কিন্তু এদের অবস্থা অতো ভালো ছিল না। কলকাতার সার্কুলার রোডের উপর রেশনের দোকান ছিল একটা। গলাটাকে একটু খাকড়ে নিল বুড়ো। এখন যা কিছু দেখছেন- এসব ত পাকিস্তান হবার পরেই- (জহির, ২০২৪:১৫১)

শাসকগোষ্ঠীর মদদপুষ্ট হয়ে ট্রলির বাবা নিজের অবস্থানের এতটাই পরিবর্তন করেছিলেন যে, তৎকালীন সময়ের আমেরিকার সবচেয়ে বিখ্যাত ও শীর্ষ কোম্পানির গাড়ি কেডিল্যাকের হুইল ধরে ট্রলির দাঁড়িয়ে থাকাটাও আসলামের মনে সৃষ্টি করে গভীর বিস্ময়ের। রেশনের দোকানের পেশা থেকে নিজের অবস্থার আমূল পরিবর্তনের পেছনে ট্রলির বাবার উল্লেখযোগ্য কঠোর পরিশ্রমের উল্লেখ কোথাও না থাকলেও পুরোটা যে ব্রেইনের খেলা তা বুঝা যায় তারই মুখনিঃসৃত কথা থেকে-"জানো আসলাম, এই যে গাড়ী বাড়ি আর ধন-দৌলত দেখছো, এ সব কিছু স্রেফ ব্রেইন দিয়ে আয় করা।" (জহির, ২০২৪:১৪১)

শ্রেণিস্বার্থের প্রয়োজনে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি পাকিস্তানের সহায়ক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। একজন স্থূল শূন্যগর্ভ মানুষ শাসকগোষ্ঠীকে অবলম্বন করে অবরুদ্ধ সময়ে কীভাবে প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে

রূপান্তরিত হয়েছিল তার প্রতীক ট্রলির বাবা। ট্রলির বাবা মাতৃভাষা ও মাতৃভূমিকে নিয়ে যে বিদ্বেষমূলক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তা মূলত শাসকগোষ্ঠীরই কণ্ঠস্বর। আবার পূর্ব বাংলাকে আধা ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্তবাদী সমাজরূপে গড়ে তুলতে সামনে এনেছেন ধর্মীয় অজুহাত-

> আসলে কি জানো আসলাম। এদেশের ছেলেমেয়েরা সব গোল্লায় গেছে। উচ্ছন্নে গেছে সব। নইলে ইসলামী ভাষা ছেড়ে দিয়ে ওই কুফুরি ভাষার জন্য এত মাতামাতি কেন? কথা তখনও শেষ হয়নি ট্রলির বাবার। ইসলামী দেশে ইসলামী ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হবে এতে কোন সন্দেহ নাই। টেবিলে প্রচণ্ড ঘুষি পড়লো তার। দেখ আসলাম, আমি যা কিছু বলি থরো স্টাডি করেই বলি। (জহির, ২০২৪:১৫০)

এসব স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করে হয়ে উঠেন দেশের হর্তাকর্তা। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসার যোগ্যতাও অর্জন করেন আশ্চর্য দক্ষতাবলে। গল্পের শুরুতে আসলামের সাথে কথোপকথন চলাকালীন ট্রলির বাবা দাবী করেন, লাইব্রেরিতে পড়াটাই তার একটা নেশা এবং তার জীবন কেটেছে বই পড়ে। বাড়ির বিশাল বড় লাইব্রেরি দেখলে কথাটা খুব একটা অবিশ্বাস করার উপায়ও থাকে না। কিন্তু ট্রলির বাবার মিথ্যাচার এবং অন্তঃসারশূন্যতা সামনে আসে তারই আরেক বক্তব্যে:

> ...ও গীটাঞ্জলী? এ নাইস, নাইস বুক। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন দেশের ভাবী শিক্ষাকর্তা, ট্রলির বাবা। বললেন, গীটাঞ্জলী, ওঃ! চমৎকার বই। মিল্টনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। (জহির, ২০২৪:১৫২)

জহির রায়হানের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা সত্তাকে খুঁজে পাওয়া যায় 'কয়েকটি সংলাপ' গল্পে। রাজনীতি সচেতন সাহিত্যিক জহির রায়হান বাংলাদেশের রাজনীতির ভূত-ভবিষ্যৎকে অত্যন্ত পরিমিত ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পটিতে। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতব্যাপ্ত বাঙালির স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অচরিতার্থ স্বপ্নের শিল্পভাষ্য 'কয়েকটি সংলাপ' গল্প। সংলাপধর্মী পরিচর্যারীতির মধ্য দিয়ে গল্পকার '৫২ এবং '৭১ কে ঘিরে বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আশাভঙ্গ এবং বাংলাদেশে দিবসকেন্দ্রিক কী ধরনের রাজনীতি হতে পারে তার একটা চিত্রনাট্য ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পটিতে। প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ক স্বপ্ন পূর্ব বাংলার জনগণ প্রথম দেখা শুরু করে ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে। কিন্তু ১৯১১-র বঙ্গভঙ্গ রদের মধ্যদিয়ে মোহভঙ্গ হয় পূর্ব বাংলার শিক্ষিত রাজনীতি সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণির। পরবর্তীতে '৪৭ এর দেশভাগকে কেন্দ্র করে স্বাধীন, সার্বভৌম দেশের স্বপ্ন দেখলেও পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণের কাছে পরাজিত হতে থাকে পূর্ব বাংলার জনগণের লালিত স্বপ্ন।

'কয়েকটি সংলাপ' গল্পে লেখক ১৯৭১ সালে দাঁড়িয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন ১৯ বছর আগের ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলন, প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের ঘটনার। ভাষা আন্দোলন কীভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপান্তরিত হলো এবং পুলিশের গুলি উপেক্ষা করে জীবন বাজি রেখে যে জনস্রোত তৈরি হয়েছিল তার চিত্র ফুটে উঠেছে নিম্নোক্ত বর্ণনায়:

> বরকতের খুন আমরা ভুলবো না।
> রফিক আর জব্বারের খুন আমরা ভুলব না।
> বিচার চাই।
> ফাঁসি চাই ওই খুনীদের।
> ভাইসব। সামনে এগিয়ে চলুন।
> ওদের গোলাগুলি আর বেয়নেটকে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলুন। (জহির, ২০২৪:১৭৫)

ভাষা আন্দোলনে নিহত বরকত, রফিক, জব্বারের হত্যার বিচার চাওয়ার মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা সুস্পষ্ট। আমরা জানি, ভাষা আন্দোলন ছিল ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল বাঙালি শিক্ষিত

মধ্যবিত্ত শ্রেণির সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। ভাষার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রদের মিছিল বের হলে পুলিশ নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর গুলি চালালে শহীদ হন সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জব্বারসহ নাম না জানা আরও অনেকে। শহীদের রক্তের বিনিময়ে পূর্ব বাংলার মানুষের প্রথম রাজনৈতিক সফলতা আসে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই। অথচ বহু প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত ভাষা আন্দোলন জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের পরিবর্তে ভবিষ্যতে যে একটি আচারসর্বস্ব দিবসে পরিণত হবে এই অমোঘ সত্য জহির রায়হান অনুভব করতে পেরেছিলেন বহু আগেই, যা তিনি আজকের সংলাপ অংশে অত্যন্ত সংক্ষেপে কিন্তু তীক্ষ্ণভাবেই তুলে ধরেছেন:

> [আজকের সংলাপ। পথে-প্রান্তরে যে সংলাপ শুনছি।]
> কি চাই?
> একুশে ফেব্রুয়ারির চাঁদা।
> কি করবেন?
> একটা ম্যাগাজিন বের করবো।
> ম্যাগাজিন বের করে কি হবে?
> বাঙলা একাডেমি থেকে ওরা পুরস্কার দেবে বলেছে। ওখানে জমা দেব। (জহির, ২০২৪:১৭৫)

আন্দোলন পরবর্তী সময়ে ভাষা আন্দোলনকে ঘিরে দলীয় রাজনীতিতেও দেখা যায় লোক দেখানো ইতিহাসপ্রেম। ইতিহাসকে ধারণ না করে রাজনৈতিক দলগুলো মেতে ওঠে নানারকম আয়োজন নিয়ে। তাজা প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত বিজয়কে নিয়ে বিশেষ দলীয় প্রেসিডেন্টের মধ্যেও দেখা যায় ভাষা আন্দোলনের ফাংশনকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতাপূর্ণ মনোভাব। অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনকে পুঁজি করে রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড ছিল জনকল্যাণের পরিবর্তে ব্যক্তিগত মান-সম্মান অর্জনের:

> ওদের চেয়ে আমাদের ফাংশন, আপনি দেখবেন অনেক ভালো হবে।
> ভালো হবে কি। ভালো হতেই হবে। এর সঙ্গে আমার মান-সম্মান জড়িয়ে রয়েছে। বুঝলে না, আমি হলাম তোমাদের প্রেসিডেন্ট। আর হ্যাঁ। আমার বক্তৃতাটা ভালো করে লিখে দিও কিন্তু। একুশে ফেব্রুয়ারির ইতিহাসটা যেন থাকে ওর মধ্যে। আর শহীদদের নামগুলো। (জহির, ২০২৪:১৭৫)

জহির রায়হান ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মতই বুঝতে পেরেছিলেন বাংলাদেশে আন্দোলনে সফল হলেও তার সুফল জনগণ হয়ত খুব একটা ভোগ করতে পারবে না। বরং আন্দোলন থেকে এদেশের মানুষের মুক্তি নেই। তাজা রক্ত দিয়ে রাষ্ট্রভাষা আদায়, যুক্তফ্রন্টে জয়লাভ, ’৭০ এর নির্বাচনে জয়লাভ সর্বোপরি ’৭১ এর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বাঙালির বিজয় অর্জিত হলেও এদেশের জনগণের ভাগ্যে বারংবার আন্দোলন সুনির্ধারিত। এমনকি ’৭১ এ বিজয় অর্জিত হলেও যেকোনো বিজয় যে কেবল দিবসকেন্দ্রিক আচার সর্বস্বতায় পরিণত হবে এবং অধিকার আদায়ের জন্য বাঙালি বারবার প্রাণ দিয়ে শহীদ হবে তাও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। যার প্রমাণ পাওয়া যায় ‘কয়েকটি সংলাপে’র আগামী দিনের সংলাপে:

> [আগামী দিনে যে সংলাপ শুনবো। পথে প্রান্তরে যে সংলাপ মুখে মুখে উচ্চারিত হবে]
> তিনশ’ পয়ষট্টি দিনে ক’টা শহীদ দিবস?
> দু’শো বিরানব্বইটা।
> বাকি থাকে ক’টা?
> তিয়াত্তরটা।
> তিয়াত্তরটা আর বাকি রেখে কি হবে?
> ওগুলোও বয়ে ফেলো।
> ...
> পুরো বছরটাকে শহীদ দিবস পালন করুক ওরা। (জহির, ২০২৪:১৭৮)

জহির রায়হানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও শিল্পসফল গল্প হচ্ছে ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’। বৃহদায়তনিক বর্ণনা এবং অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশে গল্পটিতে ভিন্ন এক মাত্রা সংযোজন হয়েছে। ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’তে আমরা নানা শ্রেণি পেশার মানুষ এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কর্মকাণ্ডের সাথে পরিচিত হই; যারা কোনো না কোনোভাবে আন্দোলনের সাথে জড়িত অথবা আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত। তৎকালীন সময়ে ঢাকাকেন্দ্রিক বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষই যে আন্দোলন নিয়ে ভেবেছিল, তার বহিঃপ্রকাশ ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ গল্প। গফুর, আমেনা, আহমেদ হোসেন, তসলিম, সালমা, আনোয়ার হোসেন, মকবুল হোসেন, বিলকিস বানু, সেলিম ও সালেহা প্রতিটি চরিত্রই একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। গল্পটিতে একুশ নিয়ে তাদের ভাবনা, স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ প্রভৃতি ঘটনা অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ গল্পের কাহিনি রাজনৈতিক। গল্পটিতে বহু চরিত্রের সমাবেশ, তাদের চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ, নানাবিধ কর্মকাণ্ড প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জহির রায়হান দক্ষতার সাথে সংক্ষিপ্ত ও পরিমিত বর্ণনার মধ্যে দিয়ে সব চরিত্রের পেশা ও আকাঙ্ক্ষা মূর্ত করে তুলেছেন সফলভাবে। গল্পটির বিশেষ দিক হচ্ছে, এখানে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক, কবি, রিকশা চালক শ্রেণীর জীবনের বাস্তব পরিস্থিতি অবলোকন করলে সে সময়ের উত্তাল অবস্থা বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না। গল্পটির অন্যতম প্রধান চরিত্র তসলিম, যিনি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে ছাত্রসমাজের প্রতিনিধি। তসলিমকে আমরা ‘সূর্যগ্রহণে’ও দেখি কবি চরিত্রে, যিনি ভাষার দাবিতে প্রাণ দিয়েছিলেন। আবার ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’তে ছাত্র তসলিমের মৃত্যু পাঠককে বাকরুদ্ধ করে তোলে। অর্থাৎ ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ ভাষা আন্দোলনের বিস্তৃত ক্যানভাসে শিল্পিত করেছে সামগ্রিক সমাজজীবন এবং ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ উত্তাল সময়কে।

জহির রায়হানের ঘটনা বর্ণনার যে পরিমিতিবোধ তা নিঃসন্দেহে চমৎকার। পরিমিত বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি তুলে ধরেছেন ভাষা আন্দোলনে মানুষের বিক্ষোভের চিত্র। বর্ণনাত্মক কিংবা বিশ্লেষণাত্মক পরিচরযারীতির পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত বাক্যরীতির মধ্য দিয়েও যে ইতিহাসের ঘটনা তুলে ধরা যায় তার জ্বলন্ত প্রমাণ:

> ধরে ধরে সবাইকে দুটো খালি ট্রাকের মধ্যে তুলে নিলো সেপাইরা। পুলিশের বড় কর্তাদের চোখেমুখে উৎকণ্ঠা।
> কত ধরবো?
> কত নেবো জেলখানায়?
> ঢেউয়ের মতো বাইরে বেরিয়ে আসছে ছাত্ররা। (জহির, ২০২৪:১৯৮)

ঢেউয়ের মতো বেরিয়ে আসার উপমা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের কারফিউ ভঙ্গ করে মিছিলে অংশগ্রহণের চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন জহির রায়হান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্রদের মিছিল যে গণমিছিলে রূপান্তরিত হবে এই ধারণাই ছিল না তৎকালীন সরকারের। কিন্তু পরবর্তীতে ছাত্রদের বিশাল মিছিল দেখে প্রশাসন ভয় পেয়ে গ্রেফতারের নির্দেশ দিলে তা রূপান্তরিত হয়ে গণচেতনায় । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলা, মধুর ক্যান্টিন থেকে শুরু হওয়া আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে ইউনিয়ন অফিস, পুকুর পাড়ে। আন্দোলনরত এই প্রতিবাদী জনগনকে গ্রেফতার করে দুই ট্রাকে তুলে নিলেও জনস্রোত না কমে বরং আরও বৃদ্ধি পাওয়ার দিকটিই উঠে এসেছে উক্ত বর্ণনায়:

> মৃতদেহগুলো রাতারাতি সরিয়ে ফেলতে হবে।
> ভোর হবার আগেই আজিমপুরায় কবর দিয়ে দিতে হবে ওদের।
> সারা শরীর ঘামাচ্ছে। (জহির, ২০২৪:২০১)

পুলিশ কর্তৃক ভাষা আন্দোলনে নিহত ব্যক্তিদের সরিয়ে ফেলার এই দৃশ্য আমরা মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকেও দেখতে পাই। 'কবর' নাটকেও লাশগুলোকে গভীর রাতে আজিমপুরে কবর দিতে নিয়ে যায় পুলিশি পাহারায় এবং নেতার উপস্থিতিতে। পুলিশ অফিসার কর্তৃক রাতারাতি মৃতদেহ সরিয়ে ফেলার ঘটনা নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল তার সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা নিরস্ত্র মানুষকে দমন, পীড়ন এবং গুম করে ফেলার এই চিত্র থেকে তৎকালীন সময়ের রাজনৈতিক নিষ্পেষণের চিত্রই প্রতীয়মান হয়। '৪৭ এর দেশভাগের পর ভাষা আন্দোলনের মিছিলেই সর্বপ্রথম গোলাগুলি ও নিহতের ঘটনা ঘটে। নাম না জানা আন্দোলনরত নিহত ব্যক্তিদের রাতের আঁধারে কবর দেওয়ার ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে মূলত শোষক গোষ্ঠীর শোষণ এবং রাজনীতির অন্ধকার বিষয়টিই গল্পকার ফুটিয়ে তুলেছেন।

একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে তাৎপর্যময় ঘটনা। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকেই পূর্ব বাংলার মানুষ রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠে এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অধিকার আদায়ের জন্য লড়াইয়ের শিক্ষালাভ করে। ভাষার দাবীতে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করলে, ক্ষমতাসীন দল মিছিলরত শিক্ষার্থীদের উপর গুলিয়ে চালিয়েছিলেন আন্দোলন দমনের জন্য। অথচ পুলিশের গুলিতে ছাত্র নিহত হলে সেই আন্দোলন গণ আন্দোলনে পরিণত হয়ে সংখ্যা বাড়তে থাকে। পুলিশ সেই বিশাল জনস্রোতে গুলি চালালে এই জনস্রোত ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। এই ঘটনাকে গল্পকার বর্ণনা করেছেন ইউক্যালিপ্টাসের পাতা ঝরে পড়ার উপমায়। যা থেকে জহির রায়হানের ভাষা প্রয়োগের দক্ষতা সহজেই অনুমেয় হয়:

> মানুষগুলো সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো অসংখ্য ঢেউ তুলে এগিয়ে আসছে সামনে।
> ইউক্যালিপ্টাসের পাতা বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে নিচে। মাটিতে। ঝরে। (জহির, ২০২৪:২০৩)

লক্ষণীয়, ইউক্যালিপ্টাস গাছ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হলেও এই গাছের পাতা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত উপকারী এবং ঔষধী গুণাগুণ সম্পন্ন। ইউক্যালিপ্টাসের পাতা থেকে নিষ্কাশিত তেল জীবাণুনাশক এবং এন্টিসেপটিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। স্বর্দি, কাশি, জ্বর, ব্রঙ্কাইটিস ও ক্ষত নিরাময়ের জন্য এই গাছের পাতায় রয়েছে বিশেষ গুণাগুণ। গল্পটিতে মিছিলে অংশগ্রহণকারী মানুষদেরকে ইউক্যালিপ্টাসের পাতার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আন্দোলনরত জনতার স্রোতকে দমনের জন্য পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে তারা যেমন একে একে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল, সে দৃশ্যটিই ইউক্যালিপ্টাসের পাতা ঝরে পড়া উপমার ভেতর দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা তৎকালীন সরকারের কাছে ইউক্যালিপ্টাসের মতোই ক্ষতিকর ছিল বলে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু এই শিক্ষার্থীদের আন্দোলনই পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তৈরি করেছিল নতুন অধ্যায়। ভাষা আন্দোলনই পূর্ব বাংলার জনমানসে স্বাধিকারের বীজ বপন করেছিল, যার ফলশ্রুতিতে জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণিপেশার মানুষের অংশগ্রহণে আমরা পেয়েছিলাম আমাদের বহুল কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক ছোটগল্পসমূহের মধ্যে 'একুশের গল্প' জহির রায়হানের অন্যতম সার্থক ও শিল্পসমৃদ্ধ রচনা। একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে লেখক গল্প লিখেছেন মোট সাতটি কিন্তু ছোটগল্পগুলোর মধ্যে একমাত্র 'একুশে ফেব্রুয়ারি' ও 'একুশের গল্প' এই দুটি গল্পের নামকরণে গল্পকার সরাসরি একুশ শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

'একুশের গল্প' '৫২-র ভাষা আন্দোলনে ঘটে যাওয়া এক মর্মস্পর্শী ঘটনার এবং একইসাথে বন্ধুত্বেরও গল্প। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবির সাথে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ছাত্র আন্দোলন, প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের। পশ্চিম পাকিস্তানের চাপিয়ে দেওয়া উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ না করে বাংলা

ভাষার দাবিতে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিলেন ছাত্রসমাজ। 'একুশের গল্প' মূলত সেই উত্তাল সময়ের আন্দোলনরত ছাত্রদের গল্প, ছাত্রদের আত্মদান একইসাথে পুলিশ কর্তৃক লাশ গুমের গল্প। গল্পটিতে উত্তম পুরুষের জবানিতে লেখকের আবেগ, অনুভূতি, স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে মূলত একই মেসে বসবাসরত মেডিকেলের শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিজীবনের ক্ষুদ্র চিত্র এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণের ঘটনা দেখতে পাই। 'একুশের গল্প' নাম হলেও এখানে শহীদ তপুর আত্মত্যাগের পাশাপাশি তার সঙ্গী রুনুর সম্পর্কের রসায়ন পাঠককে আবেগতাড়িত করে তোলে। ভাষা আন্দোলনের সবিস্তারিত বিবরণ না থাকলেও প্ল্যাকার্ড হাতে তপুর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে যাওয়া এবং চার বছর পর তপুর কঙ্কাল খুঁজে পাওয়ার মধ্য দিয়ে গল্পটিতে ভাষা আন্দোলনই মূর্ত হয়ে উঠেছে:

> ব্যাপার কি বুঝবার আগেই চেয়ে দেখি, প্ল্যাকার্ডসহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে তপু। কপালের ঠিক মাঝখানটায় গোল একটা গর্ত। আর সে গর্ত দিয়ে নির্ঝরের মতো রক্ত ঝরছে তার। (জহির, ২০২৪:২২৩)

'একুশের গল্প' ছোটগল্পের সূচনা অত্যন্ত নাটকীয় এবং অতিপ্রাকৃত। গল্পের শুরুতে বিষয়বস্তু স্পষ্টভাবে বোঝা না গেলেও গল্পকার চলচ্চিত্রিক পরিচর্যারীতির মাধ্যমে তপুর নিহত হওয়ার ঘটনাটিকে সামনে এনেছেন। জহির রায়হান গল্প রচনার পাশাপাশি চলচ্চিত্র নির্মাণে ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। ফলে তাঁর গল্পগুলোতে চলচ্চিত্রিক পরিচর্যারীতি 'flash back, flash forward' স্পষ্ট। 'একুশের গল্পে'ও এই সিনেমাটিক পরিচর্যারীতির মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের ১৪৪ ধারা জারি ভঙ্গ করে মিছিলে অংশগ্রহণ, ছাত্রদের আত্মদান ও পুলিশ কর্তৃক লাশ গুমের ঘটনা স্পষ্ট হয়েছে:

> দু'জন মিলিটারি ছুটে এসে তপুর মৃতদেহটা তুলে নিয়ে গেলো আমাদের সামনে থেকে। আমরা এতটুকুও নড়লাম না, বাধা দিতে পারলাম না। দেহটা যেন বরফের মতো জমে গিয়েছিলো, তারপর আমিও ফিরে আসতে আসতে চিৎকার করে উঠলাম, রাহাত পালাও। (জহির, ২০২৪:২২৩)

'একুশের গল্প'র তপু দেশপ্রেমিক ছিল। গল্পে দেখা যায়, এককালে সে মিলিটারিতে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতো। কিন্তু শারীরিক ত্রুটি থাকায় তার সেই স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। জন্মখোঁড়া বলে তপুর আর মিলিটারিতে যাওয়া হয় না। আবার, ডাক্তারি পড়লেও অত্যন্ত সাধারণ জীবনের স্বপ্ন দেখতো তপু। জাঁকজমকহীন ঘর, ছোট একটা ডিসপেনসারিতেই তার স্বপ্ন সীমাবদ্ধ ছিল। মাঝেমাঝে বন্ধুরা সবাই হাঁটতে গিয়ে ভাবালুতায় পর্যবসিত হয়ে তার উচ্চারণ- "এই পথের যদি শেষ না হতো কোনোদিন। অনন্তকাল ধরে যদি এমনি চলতে পারতাম আমরা।" তপুর উক্ত কথাটিই সম্ভবত সত্যি হয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ তার আজীবন পথচলা আর বন্ধ হয় না, বরং তপুর মতো অসংখ্য তপু বারবার বাংলাদেশে আসে রাজনৈতিক সব আন্দোলনে হয়ত অন্য কোনো নাম নিয়ে।

'একুশের গল্প'র নায়ক তপুকে আমরা সবাই চিনি ভাষা আন্দোলনের শহীদরূপে, যার মাথার খুলি তারই বন্ধুরা আবিষ্কার করেছিল মেডিকেল কলেজে রাখা কঙ্কাল হিসেবে। সে-ই তপুর আরও একবার জহির রায়হানের সৃষ্টিতে আসার বিষয়টি নিয়ে 'জীবনের একটু আগুন চাই' লেখায় মতিউর রহমান বলেন:

> আর কত দিন-এর নায়ক তপুকে আমরা দেখতে পাই জহির রায়হানের 'একুশের গল্পতে'ও। সেই তপু আবার ফিরে আসে আর কত দিন-এর নায়ক হয়ে। অথচ স্বাধীনতার পর অগ্রজকে খুঁজতে গিয়ে জহির রায়হানই তো আরেক তপু হয়ে যান। (মতিউর, ২০২১:১১২)

অর্থাৎ জহির রায়হান নিজেও যেন তপুরই আরেক সত্তা। যিনি প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রায় সব আন্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তাঁর পদচারণা

অনস্বীকার্য। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তাঁর হারিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনিই যেন তপুর রূপকে মিশে আছেন একুশ ও একাত্তরময় সারা বাংলাদেশে।

পরিশেষে বলা যায় যে, জহির রায়হান অত্যন্ত দক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির অংশগ্রহণকে সফলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ষাটের দশকে গ্রাম থেকে উঠে আসা নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের হাত ধরেই যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছিল, একইসাথে বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল নতুন অধ্যায় তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত জহির রায়হানের ভাষা আন্দোলন কেন্দ্রিক ছোটগল্পগুলো। উক্ত ছোটগল্পের বিষয়বস্তু ও চরিত্রের মধ্য দিয়েই মূলত বাংলাদেশের উত্থান, মধ্যবিত্তের আত্মত্যাগ, শ্রেণি মানসিকতা, মানসিক টানাপড়েন, অস্তিত্বের লড়াই ও অধিকার আদায়ের বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে। বাংলাদেশের ইতিহাস যে মূলত মধ্যবিত্ত জাতীয়তাবাদের ইতিহাস এ কথা-ই জহির রায়হানের ছোটগল্পে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে। জহির রায়হান রাজনীতি সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে তাঁর ছোটগল্পে দেশের ক্রান্তিকালীন সাহিত্যিক রূপ ফুটে উঠেছে সাবলীলভাবে। কারণ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করায় দেশের উত্তাল, ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সময়ের প্রায় সব শ্রেণি-পেশার মানুষের কর্মকাণ্ড অবলোকন করেছিলেন। মধ্যবিত্তের আত্মত্যাগ যেমন দেখেছেন, তেমনি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ফুলে ফেঁপে উঠাও দেখেছেন কাছ থেকে। ফলে একেবারেই বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং ইতিহাসের গভীর সত্যের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় তাঁর ছোটগল্পে।

আকরগ্রন্থ

জহির রায়হান (২০২৪)। *জহির রায়হান রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড*, আহমেদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা বাংলাবাজার

সহায়ক গ্রন্থ

অরবিন্দ পোদ্দার (১৩৬২)। *উনবিংশ শতাব্দীর পথিক*, কলকাতা, গুরুপদ চক্রবর্তী (প্রকাশক)।

অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৪)। *বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের স্ফূরণ*, অন্তর্মুখ, বাংলা গবেষণা পত্রিকা, ত্রৈমাসিক, ভারত, পর্ব-৩, সংখ্যা-৩

আফজালুল বাসার (১৯৮৬)। *জহির রায়হান:তাঁর সাহিত্য ও অপ্রকাশিত ডায়েরী*, ঢাকা, উত্তরাধিকারী।

আবদুল মওদুদ (২০১১)। *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ সংস্কৃতির রূপান্তর*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স।

কাজী জাহিদুল হক (২০২৪)। *জহির রায়হানের আত্মকথা ও অন্যান্য রচনা*, ঢাকা, ঐতিহ্য।

ড. প্রতাপ ব্যাপারী (২০২৪)। জহির রায়হানে গল্প: রাজনৈতিক চেতনার বিপ্রতীপে নিম্ন-মধ্যবিত্তের বিবর্ণ দিনলিপ, আত্মদীপ, আসাম, ভারত, বর্ষ ১, সংখ্যা ২

মতিউর রহমান (২০২১)। জহির রায়হান অনুসন্ধান ও ভালোবাসা, ঢাকা, প্রথমা।

যোগেশ চন্দ্র বাগল কর্তৃক গ্রন্থ সমালোচনা, (অগ্রহায়ণ ১৩৫৬) বিদ্রোহ ও বৈরিতা, প্রবাসী।

রফিকউল্লাহ খান (১৯৯৭)। *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ* (১৯৪৭-৮৪), ঢাকা, বাংলা একাডেমি।

সরওয়ার মুর্শেদ, (১৪১২), *জহির রায়হানের উপন্যাসে শ্রেণীচেতনা, ভাষা সাহিত্য পত্রিকা*, (একত্রিংশ বার্ষিক সংখ্যা), [সম্পা. সৌদা আখতার], বাংলা বিভাগ, ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

Misra, B.B (1961). *The Indian Middle Classes Their Growth in Modern Times*, London, Oxford University Press.